কালের কণ্ঠ

তারিখ ··20 NOV 2016.....
পৃষ্ঠা ·৭৪·· কলাম····৬.....

গোলাম কবির

শিক্ষার সর্বস্তরে নজরদারি প্রয়োজন

> বহুজাতিক সংস্কৃতির প্লাবনে আমাদের বাঙালিত্ব ভেসে যাওয়ার উপক্রম। আমরা বাইরের সংস্কৃতি গ্রহণ করব আমাদের বহু যুগের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। তাই বলে আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে নয়। আমাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তবে সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে উঠছে কতজন! আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যে হারে ছিল, তা বৃদ্ধি পায়নি। সনদধারীর সংখ্যা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। আর যথার্থ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমছে। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জ্ঞানদাতাদের বিদ্যার দৌড় আমরা আমজনতা জানব কেমন করে! তবে প্রকৃতি এমনই উদার যে সব কিছুকে উন্মুক্ত করে দেয় অবলীলায়। তাঁদের অনেকের জ্ঞান সাধনার পরিচয় যথাস্থানে দেখা না গেলেও ফেসবুকে কারো কারো অভিব্যক্তি আমাদের বিস্মিত করে

পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালির বাঙালিত্ব ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রথমে ভাষা ও পরে শিক্ষাকে বেছে নিয়েছিল। হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনে শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য, বাংলা ভাষার জায়গায় উর্দুকে দাঁড় করিয়ে হাজার বছরের সমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিস্মৃতির অতলে বিলীন করা, উচ্চশিক্ষার দ্বার সংকোচনের পরামর্শ ছিল। বাঙালি সেদিন এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ইতিহাসে সেই ঘটনাপ্রবাহ সংরক্ষিত আছে। আমরা তার পুনরুক্তি করব না। ১৯৬২ সালের সেই আন্দোলনের অর্ধশত বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে এসে আমরা বাস্তবে কতটুকু পেয়েছি, তা একটু মিলিয়ে দেখব। বঙ্গবন্ধু বাঙালির স্বাধীনতা এনে দিয়ে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার ফরমান জারি করেছিলেন। যথাস্থানে ইংরেজি প্রচলন সংকুচিত করেননি। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর হামদুর রহমানের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুসরণে আমরা ইংরেজির প্রতি ধাবিত হলাম। এতে বাঙালির বাঙালিত্ব খর্ব করার দরজা খুলে গেল। রাজধানী ঢাকা ও প্রত্যন্ত শহরগুলোতে ইংরেজি স্কুল গজিয়ে উঠতে লাগল। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি সেখানে রয়ে গেল উপেক্ষিত। প্রবর্তিত হতে থাকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। লেখাপড়ার মাধ্যম অবশ্যই ইংরেজি। উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হলো, বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ এতে ত্বরান্বিত হবে। বাইরের এই আড়ম্বর চলমান থাকলেও আমাদের বর্তমান প্রজন্ম কতখানি ইংরেজি শিখেছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার খতিয়ান। কেবল শিক্ষার্থী কেন, কিছু শিক্ষকও ইংরেজি দূরে থাক, শুদ্ধ বাংলা লিখতে অক্ষম। উচ্চশিক্ষার দ্বার এখন অর্গলমুক্ত। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ ছেয়ে গেছে। আর কলেজের সংখ্যা স্বাধীনতাপূর্ব কালের হাই স্কুলের চেয়েও বেশি। প্রায় সর্বত্রই চোখধাঁধানো অবকাঠামো। তবে যথার্থ শিক্ষক সেখানে দূরবীক্ষণ ছাড়া দেখা যাবে না। আমাদের দুর্ভাগ্য, কিছু শিক্ষকের ভাষাজ্ঞান ও বিষয়ের উপলব্ধি এত দীন, যা শিক্ষিতজনকে আতঙ্কিত করে। আমাদের মনে হয়েছে, এর মূল কারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর লাগামহীন পাস করানো আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত। যেখানে ডিগ্রি (পাস) পঠন-পাঠন প্রবর্তন করা যায় কি না তা বার কয়েক ভেবে দেখতে হয়, সেখানে অনার্স-মাস্টার্স প্রবর্তিত হয়েছে। সেখান থেকে বেশির ভাগই বেরিয়ে আসছে শিক্ষাহীন সনদধারী ব্যক্তি। লেখাপড়ার মান এমনই নিম্নগামী যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ভর্তীচ্ছুরা জাতিকে হতাশ করছে। শিক্ষার প্রাণশক্তি এমনিভাবে ক্ষীণ হয়ে আসছে যে একদিন গোটা জাতি শিক্ষার স্বাদ ভুলে যাবে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে লেখাপড়ার কিছুটা উন্নতি হলেও সন্তোষজনক নয়। তবে মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে লেখাপড়া যে খাবি খাচ্ছে তার প্রমাণ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফল। এদিকে কলেজ সরকারীকরণের হিড়িক পড়েছে। এখনো যেসব কলেজ সরকারি হয়নি, সেগুলোর শিক্ষকরা আন্দোলন-অবরোধে নেমেছেন। আর সদ্য জাতীয়কৃত শিক্ষকরা ক্যাডারভুক্তির জন্য দেনদরবার শুরু করেছেন। হয়তো একদিন ক্যাডারভুক্ত হয়ে যেতে পারেন কিন্তু তাতে কি শিক্ষার উন্নতি হবে? এত দিন তাঁরা সরকারি কোষাগার থেকে বেতন পাচ্ছিলেন। অথচ শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে অবদান রাখতে পারেননি। ক্যাডারভুক্ত হলেই কি রাতারাতি অলৌকিক শক্তি লাভ করবেন! আসলে শিক্ষার বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। বলা হয়ে থাকে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডকে সোজা করে দাঁড় করার জন্য যে কারিগর দরকার, তার প্রচণ্ড অভাব আমরা লক্ষ করছি। সংশ্লিষ্ট সবার এ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।

অর্ধশতাব্দীরও আগে পাকিস্তানি শাসকচক্র চেয়েছিল বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতিকে খর্ব করতে। পারেনি। আমরা কি সেই পথে অগসর হচ্ছি? বহুজাতিক সংস্কৃতির প্লাবনে আমাদের বাঙালিত্ব ভেসে যাওয়ার উপক্রম। আমরা বাইরের সংস্কৃতি গ্রহণ করব আমাদের বহু যুগের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। তাই বলে আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে নয়।

আমাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তবে সত্যিকার শিক্ষিত হয়ে উঠছে কতজন! আমার মনে হয় ৫০ বছর আগে আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা যে হারে ছিল, তা বৃদ্ধি পায়নি। সনদধারীর সংখ্যা বেড়েছে জ্যামিতিক হারে। আর যথার্থ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা দ্রুত কমছে। বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জ্ঞানদাতাদের বিদ্যার দৌড় আমরা আমজনতা জানব কেমন করে! তবে প্রকৃতি এমনই উদার যে সব কিছুকে উন্মুক্ত করে দেয় অবলীলায়। তাঁদের অনেকের জ্ঞান সাধনার পরিচয় যথাস্থানে দেখা না গেলেও ফেসবুকে কারো কারো অভিব্যক্তি আমাদের বিস্মিত করে। আমরা কোথায় আছি ভেবে পাই না।

জীবনের উপান্তে এসে মনে হয়, পাকিস্তান যা চেয়েছিল, আমরা একদা প্রতিরোধ করেছিলাম। আজ অলক্ষ্যে সেই ভূত আমাদের পরাস্ত করতে উদ্যত। ইংরেজিয়ানা বাড়লেও ইংরেজি শিখছি না। বাংলার অবস্থাও তথৈবচ। এখান থেকে অবশ্য আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়িয়ে আর শিক্ষকদের ভরণপোষণের ভার নিলেই চলবে না। যথার্থ শিক্ষা জাতির ভবিষ্যৎ সন্তানরা পাচ্ছে কি না সেদিকে কঠোর নজরদারি প্রয়োজন।

লেখক : রাজশাহী কলেজের সাবেক শিক্ষক